খসড়া

বিগত আট দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনে অর্জন ও অসম্পূর্ণতা : উন্নয়ন তত্ত্বের অগ্নিপরীক্ষা না অনিশ্চিত মহিমা?

আকবর আলি খান
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলা দীপ জ্বালানোর জন্য সকাল বেলায় সলতে পাকাতে হয়। আজকের আলোচনায় প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে শুধু আট দশকের কেন, কেন আরও দীর্ঘ অথবা স্বল্পতর সময়ের পরিসরে দারিদ্র্য নিয়ে আলোচনা করছি না। প্রথমেই কবুল করে নিই আশি বছর সময় নির্ধারণের কারণ হলো বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসণ সংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত স্যার ফজলে হাসান আবেদ এ বছরের ২৭শে এপ্রিল ৮০ বছর পূর্ণ করছেন। এ উপলক্ষেই আজকের এই ভাষণ। প্রথমেই স্যার আবেদকে অভিনন্দন জানাই। ভাবতে অবাক লাগে যে আবেদ ৮০ বছর অতিক্রম করে ৮১ বছরে পদার্পন করতে চলেছেন। তাঁর জন্মদিন প্রসঙ্গে একটি প্রৌঢ় দম্পত্তির গল্প মনে পড়ছে। অন্যমনস্ক স্বামী প্রায় প্রতি বছরই স্ত্রীর জন্মদিন ভুলে যেতেন অথচ তিনি স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতেন। এ নিয়ে স্ত্রীর মনে খুবই দুঃখ ছিল। এই দম্পত্তির এক বন্ধু স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কেন স্ত্রীর জন্মদিন ভুলে যাও? স্বামী বললেন, বয়সের ছাপ তার স্ত্রীর মধ্যে মোটেও দেখতে পান না। তাই জন্মদিনের পর জন্মদিন পার হয়ে যে তার স্ত্রীর বয়স বাড়ছে সে কথা তিনি বেমালুম ভুলে যান। বহুজাতিক কোম্পানি মোটা মাইনের চাকরির আকর্ষণ উপেক্ষা করে যে আবেদ বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন তিনি এখনো পুরোপুরি সক্রিয়। বয়সের ছাপ শরীরে কিছুটা পড়লেও মন তার এখনো সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল। এ কথা তাই মেনে নেওয়া শক্ত যে তিনি ৮০ বছর পূর্ণ করছেন। জন্মদিনে তাকে আবার জানাই প্রাণ-ঢালা অভিনন্দন। তাঁর সুস্বাস্থ্য, সুখী ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কথায় বলে, যে জাতি যা পায়নি তাই খোঁজে। ফরাসিরা মার্কিনদের নিয়ে ঠাট্টা করে বলে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষেরা যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়; তাদেও অধিকাংশেরই আভিজাত্যের সম্ভাবনা খুবই কম। তাই মার্কিনীরা যখনই টাকা-পয়সা কামাই করে তখন তারা তাদের পিতৃপুরুষের পরিচয় খুঁজে বেড়ায়। জবাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা বলে যে ফরাসি দেশে অনেক অভিজাত ব্যক্তি আছেন কিন্তু সে দেশের নৈতিক পরিস্থিতি এত শিথিল যে কে কার সন্তান সেটা নির্ধারণ করা অত্যন্ত শক্ত। মার্কিনিরা তাই বলেন যে, ফরাসিদের টাকা হলে তারা তাদের সত্যিকার বাপকে খোঁজে বেড়ায়। বাঙ্গালীদের সমস্যা আভিজাত্যের নয়, এখানে দারিদ্র্যেও হার এত ব্যাপক যে এরা পিতা বা পিতামহের পরিচয় নয়; ইতিহাসে সোণালী যুগ খুঁজে বেড়ায়। তাই বাঙালির ইতিহসে গড়ে উঠেছে সোনার বাংলার অতি -কথন।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা বাংলাদেশের ব্যাপক দারিদ্র্যের জন্য ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করে থাকে। তারা মনে করেন ব্রিটিশরা এ দেশে আসার আগে বাংলা একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল। এখানে কৃষকদের গোলায় গোলায় ধান ছিল, গলায় গলায় গান ছিল, দারিদ্র্য এখানে ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ ধারণাকে সমর্থন করে অনেক পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনীও পাওয়া গেছে। এ দেশে যত পর্যটক এসেছিলেন তাদের মতে বাংলাদেশ ছিল প্রাচুর্যের দেশ এবং পৃথিবীর কোথাও এত স্বল্পমূল্যে জিনিস কেনা বেচা হতো না। অবশ্য পর্যটকরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, বাংলায় একই সাথে দুই ধরনের মুদ্রা

চালু ছিল। এক ধরনের মুদ্রা ছিল স্বর্ণ মুদ্রা যা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হতো না; আরেক ধরনের মুদ্রা ছিল কড়ি। সাধারণ লোক কড়িতে আয় করতো, কিনতো এবং বিক্রয় করতো। পর্যটকরা স্বর্ণ মুদ্রায় আয় করতো আর কড়িতে জিনিস কিনতো কাজেই তাদের কাছে বাংলাদেশে পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে কম বলে মনে হতো।

প্রাক-ব্রিটিশ আমলের বাংলা স্বপ্ন -রাজ্য ছিল না। এ সমাজে সাধারণ প্রাক-শিল্প বিপ্লব সমাজের বেশির ভাগ লক্ষণই উপস্থিত ছিল। এখানে জীবন ছিল দার্শনিক হপসের বর্ণিত নরকের মতো দরিদ্র, নোংরা, পাশবিক এবং হ্রস্ব। এ সমাজের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল ক্ষণভঙ্গুর এবং প্রকৃতির খেয়াল খুশিতে পরিচালিত। সোনার বাংলায় তাই দুর্ভিক্ষ অজানা ছিল না। মহাস্থানগড়ের শিলালিপি হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন শিলালিপি। এই শিলালিপিতে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোনার বাংলায় তাই প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ অজানা ছিল না। শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, এ সমাজে প্রায়ই সাময়িক দুর্দশা দেখা যেতো। সমাজের সম্পদের অসম বণ্টনে ফলে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের গহ্বরও ছিল। কলকাতার জাদুঘরে রক্ষিত একটি দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শায়েস্তা খানের তথাকথিত সোনার বাংলা যুগেও জনৈক গোপীনাথ মজুমদার ১০ হাজার ৭৪ বঙ্গাব্দের ১৯শে শ্রাবণ তারিখে ইসিদর খানের কাছে নিজেকে বিক্রয় করেন। দলিলটিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, আর্থিক দুরবস্থার জন্য গোপীনাথ নিজেকে বিক্রয় করেছে। যদিও এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাদেশের ইতিহাসে সোনার বাংলা তত্ত্বের যথার্থতা নিয়ে ৯০-এর দশকে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে তবুও এখনো অনেক ঐতিহাসিকই সোনার বাংলা তত্ত্বের সমর্থক[redacted]। দলিল দস্তাবেজ থেকে ঐতিহাসিকদের জন্য সোনার বাংলা তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করা সহজ নয়। অথচ বাংলাদেশের যেসব উন্নয়ন কর্মী মাঠে-ময়দানে দারিদ্র্য নিরসনের কাজ করছেন তারা বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐতিহাসিকদের তুলনায় অতীতকে অনেক স্পষ্টভাবে দেখতে পান। একটি সাক্ষাৎকারে ফজলে হাসান আবেদ তাই যথার্থই বলেছেন, 'আমাদের একটা সাধারণ ধারণা এই যে, অতীতে বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে খুব শান্তি ছিল। সবাই খেয়েপরে ভালো থাকত। এই যে আদর্শ চিত্রটা আমাদের মনে আঁকা আছে, বাস্তবতাটা কিন্তু কখনো এমন ছিল না। আমরা দেখেছি, হাজার হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের জনগণ উপোস করেছে। আধাবেলা খেয়েছে, আধাবেলা খায়নি।[redacted]'
ব্রিটিশরা বাংলাদেশে দারিদ্র্য সৃষ্টি করেননি, কিন্তু বিরাজমান দারিদ্র্যকে আরো জটিল ও দুর্বিষহ করে তুলেছে। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশ থেকে অভাবিত পূর্ব ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়। এই লুণ্ঠনের ফলে অষ্টদশ শতকে বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ ঘটে। ব্রিটিশরা শুধু প্রাথমিক লুণ্ঠন করেই সন্তুষ্ট হননি, তারা জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দেশে শোষণ ব্যবস্থার একটি কাঠামো গড়ে তোলে।
১৯৩০ এর দশকে যখন আবেদের জন্ম তখন বাংলাদেশে ব্যাপক দারিদ্র্য ছিল। যদিও বাংলাদেশে তৎকালে কত দরিদ্র ছিল তার কোনো পরিমাণগত তথ্য নেই তবু যেসব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো ব্যাপক দারিদ্র্যের অনুমান সমর্থন করে। তীর্থঙ্কর রায়ের প্রাক্কলন অনুসারে ১৯২১ সালে ভারতে খেতমজুরদের ৪৯ শতাংশ ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে; এই হার ১৯৩১ সালে ৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৫১ সালে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হলেও এই হার ছিল ৬৫ শতাংশ, যা ১৯২১ সালের হারের তুলনায় অনেক বেশি।[redacted]
১৯৩৬ (আবেদের জন্ম) থেকে ১৯৬০ এই ২৪ বছরে বাংলাদেশে চারটি কারণে দারিদ্র্যে ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অধোগতি দেখা দেয়। প্রথম কারণটি হলো বিশ্বব্যাপী মহামন্দা। বিশ্ব বাজারে বাংলার কৃষিপণ্যের চাহিদা কমে যায়, ফলে কৃষি পণ্যের মূল্য দ্রুত নেমে যায়। একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে চালের দাম ৩৩ শতাংশ ও পাটের দাম ২৩ শতাংশ কমে যায়[redacted] (চক্রবর্তী ১৯৯৭-৫৪৭)। কৃষি পণ্যের দাম কমে গেলেও খাজনার হার অপরিবর্তিত থাকে ।

কৃষি পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় মহাজনের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় আবার পণ্যের দাম পড়ে যাওয়ায় কৃষকের পক্ষে মহাজনের ঋণ শোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেধে ওঠে। সরকার বাধ্য হয়ে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে। এতে সমস্যা কিছুটা লাঘব হলেও সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো অঞ্চলে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়।

দ্বিতীয় আঘাত আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ হতে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। মহাযুদ্ধের ফলে কোনো কোনো খাতে চাহিদা পুনরুজ্জীবিত হলেও বাংলায় খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে চালের দাম বাড়তে থাকে। ওই বছর চালের দাম ছিল মণ প্রতি প্রায় ৪ টাকা। চালের দাম আস্তে আস্তে বেড়ে ১৯৪১-৪২ সালে ৫ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৪১-৪২ থেকে ১৯৪২-৪৩ সালে চালের দাম এক লাফে ওঠে ১৪ টাকায় এবং পরের বছর ১৬ টাকায় দাঁড়ায় (রদারমুন্ড ১৯৯৬, ১২৪)। একদিকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় কমে যায় অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নাগালের বাইরে চলে যায়। ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে আনুমানিক ৩০ লাখ (যার মধ্যে সরাসরি অনাহারে ১০ লাখ ও দুর্ভিক্ষের পরোক্ষ প্রভাবে ২০ লাখ) ব্যক্তি প্রাণ হারায়।[redacted] যুদ্ধের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ভৌত অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বিনিয়োগ কমে যায়। এর ফলে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেড়ে যায়।

তৃতীয় আঘাত আসে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও ভারত বিভাগের ফলে। বাংলা বিভক্তির বড় কুফল হলো বিপুল জনগোষ্ঠীর দেশ ত্যাগ ও ভারতে অভিবাসন। একটি প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে পড়ে। বর্তমানে যেসব অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত ১৯৪১ সালে সে ভূমি খণ্ডের জনসংখ্যা ছিল ৪.১৯ কোটি। যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২.৯৪ কোটি আর হিন্দু ছিল ১.১৪ কোটি। ১৯৪১ থেকে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে দুর্ভিক্ষ ও অভিবাসন ঘটে। ফলে ১৯৯১ এর হিন্দুদের সংখ্যা থেকে সরাসরি অভিবাসনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সময়কালে বাংলাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা ২.৯৪ কোটি থেকে ৩.২২ কোটিতে উন্নীত হয়। অর্থাৎ প্রায় ৯.৫ শতাংশ হারে বাড়ে। যদি ধরে নেই ব্যাপক অভিবাসন না হলে হিন্দু জনসংখ্যা এই হাড়ে বাড়ত, তবে ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা হতো ১.২৫ কোটি। ১৯৫১ সালের আদম শুমারি অনুসারে প্রকৃত হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৩.৮ লাখ। এই হিসাব অনুসারে দেশ বিভাগের ফলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ সালের মার্চ সময়কালে প্রায় ৪১.২ লাখ হিন্দু (১৯৪১ সালে বাংলাদেশে মোট হিন্দু জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ) ভারতে চলে যায়। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিঃস্ব অবস্থায় ভারত থেকে অনেক মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এই দাঙ্গার ফলে দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হয়।

চতুর্থ আঘাত আসে পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ১৯৫০-এর দশকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে দুটি অস্বাভাবিক বন্যার ফলে। কোরিয়া যুদ্ধের ফলে পাটের দাম নাটকীয় হারে বেড়ে যাওয়াতে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন বাড়ে কিন্তু যেহেতু পাট ব্যবসা অস্থানীয় পাকিস্তানিরা নিয়ন্ত্রণ করতো তার সুফল বাংলার জনগণের কাছে পৌঁছেনি। অন্যদিকে ১৯৫৪-৫৫ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে দুটি ভয়াবহ বন্যা হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে ক্রমাগতভাবে স্থানান্তরিত করা যায়। স্বদেশ বসুর হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ৩১০ রুপি থেকে ২৬৯ রুপিতে হ্রাস পায়[redacted]। ১৯৫৯-৬০থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু আয় বেড়ে ৩১৪ রুপিতে দাঁড়ায়। তবু সামগ্রিক হিসাবে ১৯৪৯ থেকে ১৯৭০ সময়কালে অর্থাৎ একুশ বছরে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় মাত্র চার রুপি অর্থাৎ মাত্র ১ শতাংশ বাড়ে।

মুক্তিযুদ্ধে দেশের অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেশে একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রশাসন গড়ে তুলতে হয়। এই অবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে একটি ভিক্ষার ঝুড়ি হিসেবে বর্ণনা করেন। ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসাব অনুসারে বাংলাদেশের ৬১.৮

শতাংশ মানুষ ছিল নিদারুণভাবে দরিদ্র[illegible]। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষার হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে ১৯৭৭-৭৮ সালে নিদারুণভাবে দরিদ্র (যাদের ভোগের পরিমাণ ছিল ২০৮৭ কিলোর কম) ৬৭.৫ শতাংশ[illegible]। অন্যদিকে এস আর ওসমানির গবেষণা হতে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৩-৬৪ সালে গ্রামীন বাংলাদেশে দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ৯২ শতাংশ। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই হার দাঁড়ায় ৮৩ শতাংশ[৯]। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বাধীনতা অর্জনের সময় বাংলাদেশে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যে সীমার নিচে ছিল। অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে এই অবস্থা থেকে মুক্তি ছিল অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল দুজন অর্থনীতিবিদ ফাল্যানড ও পার্কিণসন তাই বাংলাদেশকে উন্নয়ন তত্ত্বের অগ্নিপরীক্ষা রূপ বর্ণনা করেছেন। তারা লিখেন, "If development can be made to succeed in Bangladesh, there can be little doubt that it could be made to succeed anywhere else. It is in this sense that Bangladesh is the test case for development."[১০]

অর্থনীতিবিদদের হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো:

* নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নতি–জন্মলগ্নে বাংলাদেশ ছিল নিম্ন আয়ের দেশ। গত চার দশকের অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছে।
* মাথাপিছু আয়ের প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি–জনসংখ্যা হ্রাস এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে মাথাপিছু আয় প্রকৃত অর্থে প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।
* খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাফল্য–১৯৭০ সালে বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হতো। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাদি জমি অনাবাদি কাজে ব্যবহারের ফলে ফসল উৎপাদনের জন্য জমির পরিমাণ কমে যাওয়া সত্ত্বেও ২০১৪ সালে মোট ৩.৪ কোটি টন খাদ্য উৎপাদিত হয়।
* দারিদ্র্যসীমার নিচে জনগোষ্ঠীর হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস–১৯৭০ সালে প্রায় ৭০% জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। বাংলাদেশ পরিকল্পকনা প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৫ সালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে বাংলাদেশে দরিদ্রের সংখ্যা ২২.৭৩ শতাংশ। আর নিম্ন দারিদ্র রেখার ভিত্তিতে ৮.৯৭ শতাংশ।
* জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস–১৯৭০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পাকিস্তানের চেয়ে এক কোটি বেশি ছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রাসে সাফল্যের ফলে এখন বর্তমানে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা তিন কোটি কম।
* মানব উন্নয়ন কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য–শিক্ষার হার বেড়েছে; শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। ১৯৭০ সালে গড় আয়ুর প্রত্যাশা ছিল ৪২। বর্তমানে এই হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০ বছর।
* মানব উন্নয়ন সূচক অনুসারে সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে মধ্য পর্যায়ে উন্নতি–জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) মানব উন্নয়নের সূচক অনুসারে সকল রাষ্ট্রের সাফল্য পরিমাপ করে থাকে। বাংলাদেশ এ মূল্যায়নে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে মধ্যম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৬ সালে যে দুজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশকে উন্নয়ন তত্ত্বের অগ্নিপরীক্ষা বলে বর্ণনা করেছিলেন, তারাই ২০০৭ সালে তাদের বক্তব্য সংশোধন করেন এবং লিখেন, "At this point, with three decades and more of experience of limited and chequered progress, sustained development in Bangladesh appears to be within reach,, though far from assured" (Faaland and Parkinson, 2007:36)[১১].

সুশাসনের অধোগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ কিভাবে এ পরিবর্তন ঘটালো এটা আজকে একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এ

সাফল্য মূলত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বিজয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে রয়েছে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি অভিবাসী শ্রমিকদের অবদান। এর পেছনে রয়েছে পোশাক শিল্পে নিয়োজিত অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মহিলাদের অবদান। রয়েছে বাংলাদেশের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কৃষকদের অবদান। এর পেছনে রয়েছে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে নিয়োজিত কোটি কোটি মহিলার সাধনা। এরা সবাই সাধারণ মানুষ কিন্তু এরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ অর্জন করেছে। সুতরাং বাংলাদেশের সাফল্যের চাবিকাঠি খুঁজতে হলে আমাদের বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের চিহ্নিত করতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন। বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে গড় আয়ুব প্রত্যাশা ছিল ৩৭ বছর। বর্তমানে এই হার দাঁড়িয়েছে ৭০-এর ওপরে। গত পাঁচ দশকে এটি একটি বড় সাফল্য। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে- কলেরা, বসন্ত ও অন্যান্য ক্ষতিকারক মহামারি প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে। প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থার কারিগরি জ্ঞান পৃথিবীর সব দেশের সরকারেরই জানা ছিল কিন্তু জনগণের মধ্যে এই জ্ঞান বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে এই জ্ঞানের প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ। এই ক্ষেত্রে প্রথমেই যার নাম আসে সেটি হলো ফজলে হোসেন আবেদের নেতৃত্বে ব্র্যাক। ১৯৮০ সালে ব্র্যাক ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি (ওটেপ) চালু করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ওর স্যালাইনকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশে এ ধরনের রোগের ক্ষতিকর প্রভাব কমে আসে। এছাড়া ব্র্যাক ইউনির্ভাসেল চাইল্ড ইমিনেজেশন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণেও তারা এগিয়ে আসেন। স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেন। এসব কর্মসূচির সাফল্যের ফলেই জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রে রোগ বালাইয়ের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষ শ্রমবাজারে তাদের অবদান রাখতে সক্ষম হোন। আফ্রিকার সাথে বাংলাদেশের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, আফ্রিকাতে এইডস মহামারি রোগ প্রতিরোধে অক্ষম হওয়াতে তাদের শ্রম শক্তির অবদান কমে যায় অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রচলিত মহামারি রোধে সক্ষম হওয়াতে বাংলাদেশের শ্রমিকরা অনেক বেশি অবদান রাখতে পারেন। প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা বিস্তারে ব্র্যাকের ব্যাপক সাফল্যের পেছনে রয়েছে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অনেক উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আবেদের নেতৃত্বে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঝরে পড়ার হার হ্রাস করার কোনো সহজ সমাধান ছিল না। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এই শিক্ষা ব্যবস্থাতে অভিভাবকদের ও ছাত্রদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা আদৌ বিবেচনায় নেওয়া হতো না। উপরন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত নিরানন্দ।

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'ছেলেটা' কবিতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বছর দশেকের ছেলেটি পরের ঘরে মানুষ। অযত্নে বেড়ে উঠছে, দুষ্টুমিতে সদাই ব্যস্ত লেখাপড়ায় তার কোনো মন নেই। তার সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

অম্বিকে মাস্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল,
শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয়-
বলে, ইঁদুরে কেটেছে।
এত বড় বাঁদর।'

আমি বললুম, 'সে ত্রুটি আমারই।
থাকত ওর নিজের জগতের কবি,
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে-
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডি।'
(সঞ্চয়িতা, পৃষ্ঠা ৬৬৭)

কাজেই উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিকে একদিকে শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে উৎপাদন ব্যাহত না করা হয় তার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সাড়া দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এ ধরনের ৩৪ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম খরচে দরিদ্র মানুষের সন্তানদেরকে শিক্ষার জগতের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। তবে এ কর্মসূচি এখানেই থেমে নেই মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যও প্রয়াস চলছে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থনীতির একটি বড় সমস্যা হলো, নারীদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অবদান সীমিত। বাংলাদেশে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে বাধা অপসারণ বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাসমূহের একটি বড় অবদান। দক্ষিণ এশিয়ার চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল কওে রাখা হয়েছে। মনুসংহিতায় বিধান দেওয়া হয়েছে যে কোনো শিশুকন্যা বা তরুণী এমনকি কোনো বৃদ্ধা মহিলাও তার নিজের বাড়িতেও তার ইচ্ছা মতো কিছু করতে পারবেন না। শৈশবে নারী পিতার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যৌবনে থাকবে স্বামীর নিয়ন্ত্রণে এবং স্বামী মারা গেলে থাকবে পুত্রদের নিয়ন্ত্রণে। তার কোনো স্বাধীনতা থাকবে না। কোনো অবস্থাতেই নারী নিজেকে তার পিতা, স্বামী বা পুত্র থেকে আলাদা করার উদ্যোগ নিতে পারবে না। যদিও পশ্চিমা জগতে এ ধরনের বিধান নেই তবু পাশ্চাত্যে অর্থশাস্ত্র মহিলাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে কিন্তু পারিবারিকভাবে যে মহিলা যে কাজ করে তার কোনো স্বীকৃতি অর্থশাস্ত্রে নেই। যদি কোনো মহিলা চাকরাণি হিসেবে কাজ করে তাহলে তার আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেই মহিলাই যদি বাড়ির কর্তাকে বিয়ে করে আরও অনেক বেশি কাজ করে তবু তার অবদান অর্থনীতির হিসাবে যোগ হয় না। এর ফলে অর্থনীতির হিসাবে জাতীয় আয় কমে যাবে যদিও বাস্তবে জাতীয় আয় বেড়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতেই অমর্ত্য সেন লিখেছেন, চাকরাণিদের বিয়ে করলে অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি হবে অর্থাৎ জাতীয় আয় কমে যাবে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন। অবশ্য এ কাজটি প্রথমে পরিকল্পিতভাবে করা হয়নি। দারিদ্র্য নিরসন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যেসব কর্মসূচিতে মহিলারা অংশগ্রহণ করেছে সেসব কর্মসূচি সবচেয়ে বেশি সফল। দারিদ্র্য নিরসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ কাকতালীয়। এ সম্পর্কে একটি গল্প আছে। গল্পটি হলো- বাংলাদেশে এক ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি চালু করে কিন্তু তার কর্মসূচি তত সফল হচ্ছিল না। তার ধারণা যে, কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব রয়েছে। একদিন রাতে তিনি গ্রামের সড়কে এ কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলেন। হঠাৎ তার পা একটি পাথরের সাথে লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে পাথরের ভেতর থেকে আলাউদ্দিনের দৈত্য হাজির হয়। দৈত্য এসে বলে তিনি আলাউদ্দিনের দৈত্য এবং তাকে পাথরের ভেতর থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি ঐ ব্যক্তিকে যে কোনো একটি জিনিস উপহার দিতে চান। কিন্তু একটির বেশি অনুরোধ তাকে করা যাবে না। ঐ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তিনি তার দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির জন্য এমন কিছু লোক চান যারা খুবই গরিব অথচ এমন কাজ করতে পারে যা অন্যরা করতে পারে না। তার ধারণা এ ধরনের প্রতিভাশালী দরিদ্রদের মাধ্যমেই দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। পরদিন ভোরে দৈত্য কিছু ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা কিছু গ্রাম্য মহিলাদের কাছে নিয়ে আসেন এবং বলেন এই হলো আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রতিভাশালী লোকজন। দারিদ্র্য নিরসনকারী ব্যক্তি মাথায় হাত দিয়ে বলল, তুমি কি করেছো। এদের পক্ষে কি দারিদ্র্য নিরসন

সম্ভব? দৈত্য বললেন যে আপনি যা চেয়েছেন আমি তাই এনেছি। আপনি দরিদ্র মানুষ চেয়েছেন আমি এই গরিব মেয়েদের এনেছি। এরা সবাই এমন কাজ করে (যেমন- মাছ কাটে, মশলা বাটে, ঘরবাড়ি ঝাড়ু দেয়) যা সাধারণ লোকেরা করতে পারে না। এদেরকে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি যা চান তাই হবে। হতাশ ব্যক্তি ভাবলেন যে সব কর্মসূচিই যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন দৈত্যের উদ্ভট পরামর্শ চেষ্টা করে দেখা যাক। দৈত্যের কথা শুনে গ্রামীণ মহিলাদের নিয়ে কর্মসূচি চালু হলে দেখা গেল কর্মসূচিগুলো অসাধারণভাবে সফল হয়েছে। আবেদ লিখেছেন, তিনি গ্রামীণ মহিলাদের দায়িত্বশীলতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি মহিলা কর্মসূচির দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মহিলারা যে দায়িত্বশীলতার সাথে তাঁর সাথে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন সে ধরনের কাজ বাংলাদেশের পুরুষরা করতে পারে না। বাংলাদেশের বড়লোক পুরুষেরা ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয় অথচ তার অধিকাংশ ফেরত দেয় না। বাংলাদেশের গরিব মহিলারা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে যে ঋণ নেয় তার শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়।

বাংলাদেশে প্রথম কে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু করেন সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ব্র্যাক যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে সেটি নিঃসন্দেহে একটি সফল প্রকল্প। ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচির কতিপয় ব্যতিক্রমধর্মী দিক রয়েছে। এ প্রকল্পে শুধু ঋণই দেওয়া হয় না, ঋণ গৃহিতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। হত দরিদ্রদের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সাফল্য অর্জন করেছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে শুধু ঋণ বিতরণই করা হয়নি তাদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়েছে। তারা মুক্তি পেয়েছেন। এই মুক্তি দেশের জন্য একটা বড় অর্জন। এর ফলেই আজকে প্রায় ৫০ লক্ষ মহিলা শ্রমিক পোশাক শিল্পে কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের একটি বড় সমস্যা হলো যে এখানে দরিদ্র-বান্ধব ব্যবসায়ের উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। দরিদ্রদের জন্য যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠা গড়ে ওঠে সেগুলো বেশির ভাগই লোকসান করে। গরিবদের পণ্য প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। এর প্রেক্ষিতে আবেদ বাংলাদেশে ষোলটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন যারা গরিবদের পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো আড়ং যা এ দেশের হতদরিদ্র মহিলাদের পণ্য দেশে ও বিদেশে ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করেছে। এসব সেবা ও পণ্য দেশের এগারো কোটির বেশি মানুষের বিভিন্ন চাহিদা মেটাচ্ছে। এ ছাড়া বীজ, মৎস্য, কৃত্রিম প্রজনন, মোরগ, দুগ্ধ, মুদ্রণ, ব্যাংকিং প্রভৃতি খাতে এখন এত সফল হয়েছে যে, এদের লাভের অর্থ দিয়েই ব্র্যাকের প্রায় আশি শতাংশ কাজের অর্থায়ন হচ্ছে। সম্পদের জন্য ব্র্যাক শুধু বাইরের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। গরিবদের স্বার্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্জিত মুনাফায় গরিবদের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্র্যাকের কর্মসূচিসমূহ গরিবদের উদ্যোক্তা হওয়ার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় যে, ব্র্যাক মূলত একটি উন্নয়নের মডেল নিয়ে কাজ করেছে। আসলে এ ধারণাটি ভুল। ব্র্যাক কোনো মডেল বাস্তবায়ন করতে যায়নি, ব্র্যাক দরিদ্রদের সাথে কাজ করতে করতে তাদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে। এই ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো বড় প্রকল্পে পরিণত হয়েছে এবং এদের একত্র করলে মনে হবে যে ব্র্যাক দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য একটি মডেলের ভিত্তিতে কাজ করেছে। আসলে একে মডেল বলা ঠিক নয়। ব্র্যাক নিজের কাজের মূল্যায়ন করছে। সফল কর্মসূচিসমূহ সম্প্রসারণ করেছে এবং যেখানে ভুল করেছে সেখানে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছে।ব্র্যাকের কার্যক্রম আজকে শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়, এ ধরনের কার্যক্রম আরো কম পক্ষে দশটি দেশে সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে গত চার দশকের দারিদ্র্য নিরসনের সাফল্য দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করছে। প্রথম হলো এই দারিদ্র্য নিরসনে কারা অর্থাৎ সরকার, বেসরকারি খাত, বেসরকারি সংস্থাসমূহ অথবা দরিদ্র জনগণকে বেশি অবদান রেখেছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এই অর্জন যথেষ্ট ও টেকসই কি না এবং এই অর্জন বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে নিয়ে যাবে কি না।

প্রথম প্রশ্নের জবাব দেওয়া অত্যন্ত শক্ত। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, Success has many fathers but failures are orphans. বাংলাদেশে বিপুল অর্থ ব্যয়ে অজস্র দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি ব্যর্থ হয়েছে। যেসব কর্মসূচি ব্যর্থ হয়েছে তার দায়িত্ব কেউই গ্রহণ করতে চান না কিন্তু বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের যে সাফল্য তাতে সরকার কৃতিত্ব দাবি করছে, রাজনৈতিক দলগুলো কৃতিত্ব দাবি করছে, বেসরকারি খাত সাফল্য দাবি করছে আবার কেউ কেউ বেসরকারি সংস্থাকে এজন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন। কৃতিত্ব কম বেশি সকলেরই আছে। অনেক তাত্ত্বিকেরা কার কাজের অবদান কতটুকু সে সম্পর্কে পরিমাণগত বিশ্লেষণ করতে চান। কিন্তু এসব তথ্যের সঠিক উত্তর শুধুমাত্র পরিমাণগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেওয়া সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে একটি ছোট বালকের গল্প বলি- 'বালকটি ছিল অত্যন্ত তুখোর। বাইরের পরিদর্শক একজন তার স্কুল পরিদর্শনে এলে শিক্ষকরা বালকটিকে এগিয়ে দিল। পরিদর্শক ইংরেজিতে তাকে জিজ্ঞেস করল তার নাম কি? বালকটি গটগট করে প্রশ্নের সঠিক জবাব দিল। তখন পরিদর্শক তাকে জিজ্ঞেস করল যে তুমি অঙ্ক করতে পারো? সে মাথা নেড়ে হাঁ বলল। পরিদর্শক তখন ছাত্রটিকে বলল, 'তুমি এই যোগটি করতো, বাবা। ধরো, আমি তোমাকে ১ টাকা দিলাম তারপর তোমার বাবা তোমাকে আরও ১০ টাকা দিল। তোমার হাতে মোট কয় টাকা হলো'? ছাত্রটি চট করে জবাব, দিল '১ টাকা'। পরিদর্শক অবাক হয়ে গেল। বলল, তুমি আমার প্রশ্নটি বুঝেছ? ছেলেটি বলল হাঁ। পরিদর্শক বললেন, 'তা হলে তুমি এ সোজা যোগটি পারছো না কেন? তোমাকে আরেকটি অঙ্ক দিই'। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে যদি ১ টাকা দেই আর তোমার শিক্ষক যদি তোমাকে আর ১০ টাকা দেয় তাহলে তোমার হাতে কয় টাকা হবে'? ছেলেটি জবাব দিল, '১১ টাকা'। পরিদর্শক বললেন, 'এই অঙ্কটি ঠিক মতো করলে আগেরটি কেন ভুল করলে'? ছাত্রটি বলল, 'আমি এটির জবাবও ঠিক দিয়েছি আগেরটির জবাবও ঠিক দিয়েছি। আপনি আর আমার শিক্ষক ওয়াদা করলে অবশ্যই আপনারা আমাকে ১১ টাকা দিবেন কিন্তু আমার বাবা প্রতিশ্রুতি দিলেও কখনো একটি পাইও আমাকে দিবেন না। কাজেই প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তর ১ টাকা ১১ টাকা নয়। ছাত্রটি পরিদর্শককে বুঝিয়ে দিল যে সঠিক যোগফল শুধু সংখ্যার ভিত্তিতে হয় না ব্যক্তি (বাবা) ভেদেও যোগের ফল ভিন্ন হতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে অর্থ ও কারিগরী জ্ঞান থাকলেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। এ প্রসঙ্গে আমরা ভারতের সাথে বাংলাদেশের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা তুলনা করতে পারি। ভারতে মাথাপিছু আয় আন্তর্জাতিক ডলারে ৫৭০১ ডলার বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৩১২৩ ডলার। ভারতের সরকার বাংলাদেশের সরকারের মতোই দারিদ্র্য নিরসনে তৎপর। ২০১১ সালে আদম শুমারি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে ৫০ শতাংশ লোক উন্মুক্ত স্থানে শৌচ কাজ করে থাকে অথচ একই সময়ে (অমর্ত্য সেন ও জঁ ড্রেজের প্রাক্কলন অনুসারে) বাংলাদেশে মাত্র ৮ শতাংশ লোক প্রকৃত অর্থে উন্মুক্ত স্থানে শৌচ কাজ করে [১২]। ভারত উন্মুক্ত স্থানে শৌচ কাজ করা হ্রাস করতে পারেনি তার কারণ হলো সেখানে সরকার, জনগণ, বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযুগে এ লক্ষ্য অর্জন করার উদ্যোগ নিতে পারেনি অথচ বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে অনুঘটকের (catalytic) কাজ করেছে ও সকলের সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আরেকটি উদাহরণ দেই। ২০১০ সালে ভারতে মাত্র ২৯ শতাংশ মহিলা শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ করে। একই সময়ে বাংলাদেশে এই হার ছিল ৫৭ শতাংশ। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে ধর্ম নির্দেশিত পর্দাপ্রথা মুসলমান নারীদের অন্দরে আবদ্ধ করে রেখেছে। অথচ বাংলাদেশে মুসলমান নারীদের সংগঠিত করে বেসরকারি সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ভারতের প্রায় দ্বিগুনের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলারা ভারতীয় মহিলাদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। এর ফলে অনেক সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে। এর একটি বড় কারণ হলো বাংলাদেশে ব্র্যাকের মতো অনেক বেসরকারি সংস্থা মানুষের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। এই দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের ফলেই মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং আর উন্নত মানব সম্পদ দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনে যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য তাতে আত্মতৃপ্তির যেরকম সুযোগ রয়েছে তেমনি উদ্বেগেরও কারণ রয়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের যে অর্জন সেটা অনেকের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। বিশেষ করে গত চার দশকে দরিদ্রের হার ৭০ শতাংশ হতে ২৫ শতাংশের নিচে নেমে আসা একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক সূচিতেও অগ্রগতি দেখা গেছে। কিন্তু এই অর্জনের মহিমা দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ রয়েছে। স্পষ্টতই ৬টি দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে।

প্রথমত, মানুষের ক্ষুধার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ঠিকই কিন্তু পুষ্টির যথেষ্ট উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশে অপুষ্টির হার সাহারা অঞ্চলের অনেক দেশের চেয়েও নিচে। উপরন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে মানুষের বাসস্থানের সংকট বেড়েছে, নিরাপদ পানির সংকট ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

দ্বিতীয়ত, মাথাপিছু আয় বেড়েছে ঠিকই কিন্তু আয়ের বৈষম্য অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশে জিনিসহগের (GINI Coeficient) পরিমাপ ছিল ০.৩৬ শতাংশ। ২০১০ সালে এ হার ০.৪৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দেশে জিনিসহগের পরিমাণ ০৪ শতাংশের কম। ৩১ শতাংশ দেশে জিনিসহগের পরিমাণ ০৪ থেকে ০৬ এর মধ্যে। মাত্র ৩.৫ শতাংশ দেশে জিনিসহগের পরিমাণ ০৬ এর উর্ধ্বে। গত দুই দশকে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসাম্য নিম্ন পর্যায় থেকে মধ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অশুভ সংকেত।

তৃতীয়ত, শিক্ষার পরিমাণগত সাফল্য সুস্পষ্ট কিন্তু শিক্ষার গুণগতমান নিম্ন অভিমুখী। ২০১০ সালে বাংলাদেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার হার ছিল ৫৭ শতাংশ, ১৯৬০ সালে এ হার ছিল ২২ শতাংশ কিন্তু ৫৭ শতাংশ শিক্ষিতের হার যথেষ্ট নয়। চীনে এই হার ৯৪ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়াতে ৯৩ শতাংশ, ভিয়েতনামে ৯৩ শতাংশ। অমর্ত্য সেন ও জঁ ড্রেজ ভারতের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন, 'School education in India is in a terrible state.' অনুরূপ ভয়াবহ অবস্থা বাংলাদেশেও বিদ্যমান।

চতুর্থত, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সাফল্য অর্জিত হয়েছে, গড় আয়ুর প্রত্যাশা বেড়েছে কিন্তু রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যয় অপ্রতুল। দূষিত পরিবেশে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অনুপস্থিত।

পঞ্চমত, বাংলাদেশে দারিদ্র্য যে হারে কমেছে সে হারে বেকারত্ব কমেনি। সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৩.৪৫। এই হার সত্য বলে ধরে নিলে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ শিল্পোন্নত দেশসমূহের তুলনায় কম। এ ধরনের উপাত্ত আমাদের সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয়: 'Lies, Damn lies and statistics'। পশ্চিমা জগতে যে সংজ্ঞায় বেকারত্বের হিসাব করা হয় সেই সংজ্ঞায় বাংলাদেশে বেকারত্বের হিসাব সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব উন্নত দেশগুলোর দৃশ্যমান বেকারত্বের সাথে তুলনীয়। ২০১০ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত শ্রম শক্তি সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২০.৩ শতাংশ দৃশ্যমান প্রচ্ছন্ন বেকার [১৩]। যারা সপ্তাহে গড়ে ৩৫ ঘণ্টার কম কাজ করেন তাদেরকে দৃশ্যমান প্রচ্ছন্ন বেকার বলে চিহ্নিত করা হয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে এই প্রচ্ছন্ন বেকারদের বাইরে প্রায় ৯০ লক্ষের বেশি অদক্ষ শ্রমিক প্রবাসে অতি নিম্ন পর্যায়ের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সাল সময় কালে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ২০ থেকে ২৫ শতাংশের মধ্যে। এই সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশে গত দশকে বিপুল পরিমাণ চাকরি সৃষ্টির পরও মহামন্দা বিরাজ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বেকারত্ব হ্রাসের জন্য কার্যকর বিনিয়োগ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের মহিমা অনিশ্চিত থেকে যাবে।

সবশেষে বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা রয়েছে। উন্নয়নের সোনার ফসল জনগণের দূরগোড়ায় তুলে দিতে হলে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনের পথে অনেক দূর এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাকে আরও অনেক দূর যেতে হবে। এ কাজ এক প্রজন্মে সমাপ্ত হবে না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর জন্য শুধু বিনিয়োগ ও কারিগরী পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়; এর জন্য মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আবেদ যথার্থই বলেছেন, 'Addressing this culture of poverty necessitates change at both the societal and individual levels. BRAC had been addressing the needs of the poor at the grassroots with its economic and social development programmes and has also been building institutions that would spearhead changes at the societal level. The logic of BRAC programmes is the creation of an 'enabling environment' in which the poor can participate in their own development' [১৪]

বাংলাদেশের জন্য দারিদ্র্য নিরসনই যথেষ্ট নয়। দারিদ্র্য নিরসনের সাথে সাথে এখানে সুশাসনও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুশাসন ও দারিদ্র্য নিরসনের সম্পর্ক নিয়ে চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস যথার্থই বলেছেন, In a country well-governced poverty is something to be ashamed of. In a county badly governed wealth is something to be ashamed of অর্থাৎ সুশাসিত সমাজে দারিদ্র্যের উপস্থিতি লজ্জার বিষয়। যে দেশে দুঃশাসন রয়েছে সে দেশে বিত্ত হলো লজ্জার বিষয়। বাংলাদেশে বিত্তের জন্য গর্ব সৃষ্টি করতে হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাংলাদেশের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। কারণ সুশাসন একই সাথে পথ ও গন্তব্য।

প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের অভিজ্ঞতা কি উন্নয়ন তত্ত্বের অগ্নিপরীক্ষা না অনিশ্চিত মহিমা? উপরের আলোচনা থেকে মনে হয় দুটি মূল্যায়নের পক্ষেই যুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রচলিত নৈরাশ্যবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ছে। এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। অর্থনীতিবিদরা তার খুবই সমালোচনা করতো। তাই রাজা অর্থনীতিবিদদের একদমই দেখতে পারতেন না। একবার দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রাজা উপায় না দেখে মন্ত্রীকে বললেন, তিনি যেন অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে জানান। মন্ত্রী যথাবিহীত পরামর্শ করে রাজার কাছে এলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন যে, অর্থনীতিবিদরা তোমাকে কি পরামর্শ দিলো। মন্ত্রী বললেন, অর্থনীতিবিদরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একভাগে অর্থনীতিবিদরা নৈরাশ্যবাদী আরেক দিকের অর্থনীতিবিদরা অতি নৈরাশ্যবাদী। রাজা বললেন, নৈরাশ্যবাদীরা কি বলে? মন্ত্রী বললেন, নৈরাশ্যবাদীরা বলছে যে দেশে কমপক্ষে ৫০% মানুষকে ঘাস খেয়ে থাকতে হবে। রাজা বললেন তাহলে অতি নৈরাশ্যবাদীরা কি বলেছে। মন্ত্রী জবাব দিলো, তারা বলছে যে ৫০ শতাংশ মানুষকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট ঘাসও পাওয়া যাবে না। উন্নয়ন তত্ত্বের প্রবক্তারা অনেকেই বাংলাদেশ সম্পর্কে এ ধরণের অতি নৈরাশ্যবাদী চিত্র তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এ অতি নৈরাশ্যবাদী ধারণাকে নস্যাৎ করেছে এবং এর ফলে মানুষের মনে আশার আলো জেগেছে।এই দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন তত্ত্বের অতি নৈরাশ্যবাদী ব্যাখ্যা বাংলাদেশে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেণ নি ।

তবে গত চার দশকের অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করছে যে, বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনো অনেক অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এই অসম্পূর্ণতা দূর করা সহজ সাধ্য নয়, এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি সাধনার। এ সাধনায় হয়তো পুরো পথ আবেদ আমাদের সাথে থাকবেন না। ২০০৫ সালে আবেদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তার মনে কোনো দুঃখ আছে কি না। তার উত্তরে তিনি বলেছেন, So the regrets are that I am nearly seventy now, and if I was fifty, I could have looked forward to another twenty years of useful activity. I am regretting

that I have very few years to work and that much time has passed but much work still needs to be done. অবশ্যই আবেদ আরও দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারলে সেটা বাংলাদেশের দরিদ্রদের জন্য সুসংবাদ হবে [১৫]। তবে বাংলাদেশের মতো জটিল দারিদ্র্যের নিরসন এক প্রজন্মে সম্ভব নয়। আবেদ- পরবর্তী প্রজন্মকে আরও অনেক সমস্যার সমাধান করতে হবে। আবেদ তাদের জন্য রেখে যাচ্ছেন তাঁর জীবনের আদর্শ। যে আদর্শের মূল ভিত্তি হলো দরিদ্র মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আবেদ দরিদ্রদের কথা ভেবেছেন, তাদের কথা শুনেছেন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল ব্যবহার করে অনেক দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করেছেন। আগামী দিনে যারা দারিদ্র্য নিরসনের সংগ্রামে ব্রতী হবেন তাদেরকে আবেদের এই আদর্শ অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আবেদের নেতৃত্বে ব্র্যাকের লক্ষ্য হলো, ‘A world free fom all forms of exploitation and discrimination where everyone has the opportunity to realize the potential.’ আগামী দিনে এ লক্ষ্য বাস্তবায়িত হোক আবেদের শুভ জন্মদিনে এই আমাদের কামনা।

পাদটীকা

১। সোনার বাঙলা বিতর্ক প্রসঙ্গে দেখুন, আকবর আলি খান। ১৯৯৩। সোনার বাংলাঃ কিংবদন্তী ও বাস্তব। বাংলাদেশের ইতিহাস।দ্বিতীয় খন্ড। সম্পাদিত সিরাজুল ইসলাম। ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।সুশীল চৌধুরী। ১৯৯৩। সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা। বাংলাদেশের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রাগুক্ত। বিপ্লব দাসগুপ্ত।২০০৪। বাঙালি জাতি ও বাঙলা ভাষা। কলকাতাঃ দে জ পাবলিশিং

২।গোলাম মোর্তেজা।২০০৬। ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক। ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স,১৫৯।

৩।তীর্থঙ্কর রায়। ২০০৮।দি ইকোনোমিক হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া। দিল্লীঃ অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস।,৮৮।

৪।রতন লাল চক্রবর্ত্তী। ১৯৯৩।গ্রামীন ঋণিতা।বাংলাদেশের ইতিহাস।দ্বিতীয় খণ্ড।সম্পাদিত সিরাজুল ইসলাম। ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশীয়াটিক সোসাইটি।

৫। রদারমুণ্ড ডিয়েটমার। ১৯৮৮। এন ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া। লন্ডনঃক্রুম হেলম।

৬।স্বদেশ আর বোস।১৯৮৩। দি পাকিস্তান ইকোনমি সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স (১৯৪৭-৭০)। দি ক্যামব্রিজ ইকণোমিক হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া। দ্বিতীয় খণ্ড।সম্পাদনা ধরম কুমার। নয়া দিল্লীঃ অরিয়েন্ট লংম্যান

৭।আই,এল,ও।১৯৭৭। পর্ভাটি ও ল্যান্ডলেসনেস ইন রূরাল এশীয়া,১৪৭।

৮।কিউ কে আহমেদ ও এম হোসেন। ১৯৮৫। এন ইভেলুয়শন অব সিলেক্টেড পলিসিস এন্ড প্রোগ্রামস ফর দি এলিভিয়েশন অব রুরাল পভার্টি ইন বাংলাদেশ।ঢাকাঃ বি,আই,ডি,এস।

৯।এস আর ওসমানি।১৯৮২। ইকনমিক ইনিউয়েলিটি এণ্ড গ্রুপ ওয়েলফেয়ার। অক্সফোর্ডঃ ক্ল্যারেন্ডন প্রেস,১২৬।

১০।ফাল্যাণ্ড জাস্ট আন্ড জে আর পারকিনসন। ১৯৭৬। বাংলাদেশঃ দি টেষ্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট। ঢাকাঃ ঈউনিভারসিটি প্রেস।

১১। ফাল্যান্ড এন্ড জে আর পারকিনসন।২০০৬। বাংলাদেশ দি টেষ্ট কেইস ফর দেভেলপমেন্ট রিভিজিটেড। সমপাদিত কাজী শাহাবুদ্দিন ও রূশিদান ইসলাম রহমান।ডেভেলপমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড ইমারজিং চ্যালেঞ্জেস। ঢাকাঃ ইউনিভারসিটি প্রেস।

১২।অমর্ত্য সেণ ও জঁ দ্রেজ।২০১৩।এন আনসেরটেন গ্লরি ইন্ডিয়া এন্ড ইটস কন্ট্রাডিকশন্স।লণ্ডনঃ এলেন লেইন।

১৩। রিজওয়ানুল ইস্লাম।২০১৫। উন্নয়ন ভাবনায় কর্মসংস্থান ও শ্রম বাজার।ঢাকাঃ ইউনিভারসিটি প্রেস।

১৪। গোলাম মোর্তোজা। প্রাগুক্ত

১৫। গোলাম মোর্তোজা। প্রাগুক্ত,২৩৯।